চতুর্থ অধ্যায়:

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা উপন্যাসে জাদুবিশ্বাসের পরিগ্রহণ

বাংলা সাহিত্যে জাদুবিশ্বাসের ধারাবাহিক ইতিহাসে প্রথম ঝাঁকুনিটা আসে ঊনবিংশ শতাব্দীতে। দীর্ঘদিন ধরে সংস্কার-কুসংস্কার-অন্ধবিশ্বাসের একচ্ছত্র আধিপত্যের জায়গাটায় আঘাত করল বিজ্ঞান। পুরনো বিশ্বাসগুলো আস্তে আস্তে পিছু হটতে শুরু করল। যুক্তিবাদের প্রথম ধাক্কায় বাংলার মানুষের স্থবিরতা ভাঙল। তারা নড়ে চড়ে উঠে বসল। তারপর দ্বিধাগ্রস্ত মনে আধুনিক চিন্তাচেতনার মুখে তিন পা করে এগিয়ে, আবার পুরনো ঐতিহ্যের টানে দু'পা-দু'পা পিছিয়ে আসতে লাগল। বাংলার চেতন-চৈতন্য জুড়ে গতি ও স্থিতির এই দোলাচলতার সাক্ষী হয়ে রইল সে সময়ের সাহিত্য।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪):

ঊনবিংশ শতাব্দীর উপন্যাসের ইতিহাসে প্রথম নামটি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৮৯৪)। তৎকালীন দ্বান্দ্বিক আবহ সেদিন বিপর্যস্ত করেছিল বঙ্কিমকেও। "বঙ্কিমচন্দ্রের মন ছিল পশ্চাতে, কিন্তু চোখ ছিল সম্মুখে। পাশ্চাত্য দার্শনিকদের যুক্তিবাদ এবং বৈজ্ঞানিকদের নির্মোহ তত্ত্বানুসন্ধান প্রণালী তাঁহার বুদ্ধিকে প্রদীপ্ত করিয়াছিল। নিগূঢ় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে তিনি স্বদেশী সমাজ, রাষ্ট্রনীতি, বিদেশী শাসনের স্বরূপ, সামাজিক বৈষম্যের উৎস ইত্যাদি উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন, তাঁহার রাষ্ট্রচিন্তায় যুক্তির বলিষ্ঠতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তাঁহার মন ছিল অতীতের মোহময় ইন্দ্রপুরীতে, তাই বুদ্ধির কথার সঙ্গে মনের কথার অপরিহার্য বিরোধ দেখা দেয়, বঙ্কিম মানসে এক ঘোরতর সংকট সমুপস্থিত। একদিকে যুক্তিহীন আবেগ, অপরদিকে নির্মোহ যুক্তিবাদ, এই দুই পরস্পরবিরোধী প্রবাহের ঘাতপ্রতিঘাতে তাঁহার মন ভয়ঙ্কর আলোড়িত হইতেছে।"[১] খুব স্বাভাবিকভাবেই, বঙ্কিমের সাহিত্যেও সেই অস্থিরতা প্রকট। উচ্চশিক্ষা, বিশেষত ইংরেজিশিক্ষণ মারফৎ বিজ্ঞানবাদ আর অভ্যাসলালিত ঈশ্বর-অদৃষ্ট-জ্যোতিষ-

তন্ত্র-মন্ত্র-জাদু-ধর্মীয় নানান বিধি-নিষেধের মাঝে দোলকের মতো আন্দোলিত হয়েছিল তাঁর লেখনী। তাই 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) থেকে 'সীতারাম' (১৮৮৭)—তাঁর কোনো উপন্যাসই জাদুবিশ্বাসকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে এগোতে পারেনি; জাদুবিশ্বাস আর সে বিশ্বাসের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ অনুপ্রবেশ করেছে উপন্যাসের অস্থি-মাংস-মজ্জায়। কখনো সেসব প্রসঙ্গ তুচ্ছ অনুষঙ্গ হয়ে কাহিনির আশেপাশে ছড়িয়ে থেকেছে, কোথাও নেমেছে বেশ বড়ো সড়ো ভূমিকায়। যেমন, 'যুগলাঙ্গুরীয়' (১৮৭৪) বা 'সীতারাম'; যেখানে কাহিনি তৈরিই হয়েছে জ্যোতিষগণনার ওপর ভিত্তি করে।

"(জ্যোতিষী গণনা করিয়া দেখিলাম) যে, তুমি যে কল্পনা করিয়াছ, তাহা কর্তব্য নহে। (হিরণ্ময়ী তুল্য সোনার পুত্তলিকে) কখন চিরবৈধব্যে নিক্ষিপ্ত করা যাইতে পারে না। তাহার (বিবাহ হইলে ভয়ানক বিপদ।) তাহার চিরবৈধব্য ঘটিবে গণনা দ্বারা জানিয়াছি। তবে পঞ্চ বৎসর (পর্য্যন্ত পরস্পরে) যদি দম্পতি মুখদর্শন না করে, তবে এই গ্রহ হইতে যাহাতে নিষ্কৃতি (হইতে পারে) তাহার বিধান আমি করিতে পারি।"[২]
আর,
"পাত্রের কোষ্ঠী গণনা করিয়া জানিলেন যে, পাত্রটির অশীতিবৎসর পরমায়ু। তবে অষ্টাবিংশতি বৎসর অতীত হইবার পূর্ব্বে এবং বিবাহের পঞ্চবৎসর মধ্যে পত্নীশয্যায় শয়ন করিয়া তাঁহার প্রাণত্যাগ করিবার সম্ভাবনা। কিন্তু যদি কোন রূপে পঞ্চবৎসর জীবিত থাকেন, তবে দীর্ঘজীবী হইবেন।"[৩]

—এই দুই গণনা থেকেই 'যুগলাঙ্গুরীয়' কাহিনির উৎপত্তি, বিস্তার ও পরিণতি। তবে এখানে জ্যোতিষ ঠিক কতটা অভ্রান্ত, ঔপন্যাসিক তা প্রমাণের সুযোগ পাননি, পেয়েছেন 'সীতারাম' উপন্যাসে। 'দৈবজ্ঞ'-এর গণনা অনুযায়ী শ্রীর "কোষ্ঠীতে বলবান্ চন্দ্র স্বক্ষেত্রে অর্থাৎ কর্কট রাশিতে থাকিয়া শনির গণনা ত্রিংশাংশগত হইয়াছিল।... যাহার এরূপ হয়, সে স্ত্রী প্রিয়-প্রাণহন্ত্রী হয়। অর্থাৎ আপনার প্রিয়জনকে বধ করে।"[৪] এ ভবিষ্যদ্বাণীকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে এ কাহিনি, নিয়ন্ত্রিত হয়েছে কাহিনির চরিত্রগুলির কার্যকলাপ। কাহিনিশেষে এ ভবিষ্যদ্বাণী সত্যিও হয়েছে; শ্রীর কারণে মৃত্যু ঘটেছে তার ভাই গঙ্গারামের।

শুধু এখানেই নয়, লক্ষণীয়, উপন্যাসগুলিতে প্রতিটি ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎকথন, পূর্বসংকেতকে অভ্রান্ত প্রমাণ করা হয়েছে, প্রত্যেকটি জাদুক্রিয়াকে করা হয়েছে সফল। সে 'দুর্গেশনন্দিনী'তে অভিরাম স্বামীর গণনা হোক, 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬)-য় কালীর দৈবনির্দেশ, কিংবা 'মৃণালিণী' (১৮৬৯)-তে মনোরমার অন্তিম পরিণতি বিষয়ে জ্যোতির্বিদের সিদ্ধান্ত; 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩)-এ কুন্দনন্দিনীর প্রতি স্বপ্নসংকেত হোক, আর 'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫)-এ মীরকাশিম-চন্দ্রশেখরের জ্যোতির্গণনা বা রমানন্দ স্বামীর কমণ্ডলুস্থিত জলের অলৌকিক ক্ষমতা; 'রজনী' (১৮৭৭)-তে সন্ন্যাসীর জাদুক্রিয়া হোক, কিংবা 'রাজসিংহ' (১৮৮২)-এ জ্যোতিষীর চঞ্চলকুমারী-মবারকের 'কেসমৎ' গণনা, বা 'আনন্দমঠ' (১৮৮৪)-এ 'এক অপূর্ব্বদৃশ্য প্রকাণ্ডাকার জটাজুটধারী মহাপুরুষ'[৫]-এর মৃতসঞ্জীবন—বঙ্কিমের অলৌকিক-কারনামাকারীরা কোথাও লক্ষ্যভ্রষ্ট নয়।

এইসব বড়োসড়ো জাদুর পাশাপাশি ছোটখাটো জাদুক্রিয়া-জাদুবিশ্বাসগুলোও এড়িয়ে যাবার নয়। কাহিনির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে সমাজ আর সামাজিকের উপস্থাপনায় তারাও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে সংস্পর্শমূলক ও অনুকৃতিমূলক জাদুবিশ্বাস, কৃষ্ণ ও শুক্ল জাদুবিশ্বাস, প্রবর্তক ও নিবর্তক জাদুবিশ্বাস, ফেটিশ, শপথ, আশীর্বাদ, অভিশাপ, অদৃষ্ট অলৌকিক জ্যোতিষে বিশ্বাসের কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে, অন্যগুলির পৃষ্ঠা সংখ্যা উল্লেখ করা হলো। ঈশ্বরে বিশ্বাস, পাপ-পুণ্য জাতীয় তত্ত্বগত জাদুবিশ্বাসগুলি উল্লেখিত হল না।

সংস্পর্শমূলক জাদুবিশ্বাস:

দুর্গেশনন্দিনী(১৮৬৫)—

"মুসলমানেরা মুরগির পালো খাওয়ানোয় গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজের হিন্দুত্ব গেল, সে মুসলমান হলো।"[৬]

মৃণালিনী (১৮৬৯)—

মৃণালিনী। 'তোমার চুলে দেবতার ফুল আছে। তাহা ছুঁয়ে শপথ কর।'[৭]

রাধারাণী(১৮৮৬)—

দেবেন্দ্রনারায়ণ। "শুভলগ্নযুক্ত সুতহিবুক যোগটা খুঁজুন না?" ... চিত্রা বলিল, ... পুরোহিত পর দিন বিবাহের উত্তম দিন বলিয়া গিয়াছেন।'[৮]

এছাড়াও উপন্যাসগুলি থেকে সংস্পর্শমূলক জাদুবিশ্বাসের পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি উল্লেখ করা হল-

মৃণালিনী (১৮৬৯)—পৃ ২০১, ১৫৯

বিষবৃক্ষ(১৮৭৩)- পৃ ২২৮,২৮৪

চন্দ্রশেখর(১৮৭৫)- পৃ ৩৬১, ৪২১

রজনী(১৮৭৭)- পৃ ৪৫২

অনুকৃতিমূলক জাদুবিশ্বাস:

ইন্দিরা(১৮৭৩)—

শ্বশুরবাড়ি যাত্রাকালে বোন কামিনীর "মরণ আর কি!"[৯] বলার সঙ্গে যাত্রাপরবর্তী দুর্ভাগ্যের সংযোগসূত্র টানার চেষ্টা করেছে ইন্দিরা।

কৃষ্ণজাদুবিশ্বাস:

কপালকুণ্ডলা(১৮৬৬)—

শ্যামা। 'আজ রাত্রে যদি ঔষধটি তুলিয়া রাখিতাম, তবু তারে বশ করিয়া মনুষ্যজন্ম সার্থক করিতে পারিতাম। ... দিনে তুলিলে ফল্‌বে কেন? ঠিক্ দুই প্রহর রাত্রে এলোচুলে তুলিতে হয়।'[১০]

কৃষ্ণকান্তের উইল(১৮৭৮)—

‘সুরধুনী আসিয়া বলিলেন, “বলি মেজ বৌ, বলি বলেছিলুম, মেজবাবুকে অষুধ কর। তুমি হাজার হৌক গৌরবর্ণ নও, পুরুষ মানুষের মন ত কেবল কথায় পাওয়া যায় না, একটু রূপ গুণ চাই।’[১১]

এছাড়াও উপন্যাসগুলি থেকে কৃষ্ণজাদুবিশ্বাসের পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি উল্লেখ করা হল-

দেবী চৌধুরাণী(১৮৮৪)- পৃ ৭৮৮

রাজসিংহ(১৮৮২)- পৃ ৬২৩

আনন্দমঠ(১৮৮৪)- পৃ ৬৭৫

শুক্লজাদুবিশ্বাস:

চন্দ্রশেখর–

‘রমানন্দ স্বামী বলিয়াছিলেন, “ঔষধ আর কিছু নহে, কমণ্ডলুস্থিত জলমাত্র।” চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “ইহাতে কি হইবে?” স্বামী বলিয়াছিলেন, “কন্যা ইহাতে যোগবল পাইবে।”[১২]

এছাড়াও উপন্যাস থেকে শুক্লজাদুবিশ্বাসের পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি উল্লেখ করা হল-

রজনী(১৮৭৭)- পৃ ৪২১, ৪৮৬

প্রবর্তক জাদুবিশ্বাস:

দুর্গেশনন্দিনী-

বিমলা। “আজ আমার বীরপঞ্চমীর ব্রত, ব্রত করিলে বীরপুত্র হয়; তাহাতে রাত্রে পূজা করিতে হয়।”[১৩]

মৃণালিনী—

গ্রহশান্তি করালে জ্যোতিষী ঘোষিত ভবিষ্যৎ-দুর্ভোগের হাত থেকে নিষ্কৃতি মেলে।[১৪]

বিষবৃক্ষ—

অমাবস্যায় লুচি পাঁঠা দিয়ে পুজো দিলে পেত্নী সন্তুষ্ট হয়।[১৫]

এছাড়াও উপন্যাসগুলি থেকে প্রবর্তক জাদুবিশ্বাসের পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি উল্লেখ করা হল-

মৃণালিনী—পৃ ৩৮, ৪০

দুর্গেশনন্দিনী-পৃ ৭, ১৫

কপালকুণ্ডলা- পৃ ৯১, ৯২, ১০০, ১০২,

যুগলাঙ্গুরীয়(১৮৭৪)- পৃ ৩৪৬

চন্দ্রশেখর- পৃ ৩৭১, ৩৯৬, ৪২১

কৃষ্ণকান্তের উইল- পৃ ৫২৯, ৫৩৭, ৫৩৮

রাজসিংহ- পৃ ৫৯৪, ৬০০, ৬০৩, ৬২৭, ৬৫৭, ৬৬৭

আনন্দমঠ- পৃ ৭০৫

দেবী চৌধুরাণী- পৃ ৭৫৫, ৭৬৯, ৭৭৯, ৭৯২, ৮১৭, ৮১৪

সীতারাম- পৃ ৮২৭, ৮২৮, ৮৩০, ৮৪২, ৮৪৬

রাধারাণী- পৃ ৪৪৩-৪৪

ইন্দিরা- পৃ ৩০০, ৩০২

নিবর্তক জাদু:

কপালকুণ্ডলা –

১. নবকুমারকে বাঘে খেয়েছে বোঝাতে নৌকার ‘একজন নাবিক কহিল, “আঃ, তোর নবকুমার কি আছে? তাকে শিয়ালে খাইয়াছে।”[১৬]

২. দেবীকে অর্পিত বিল্বপত্র যদি খসে যায় তবে মানস অমঙ্গলময় এবং অবশ্য পরিত্যজ্য।[১৭]

রজনী –

শচীন্দ্রকে স্বামী হিসেবে পাবার রাস্তাটি পরবর্তীকালে রজনীর সুগম হয়নি। তাই তার মনে হয়েছে—'সেই সময় কি পোড়া লোকের চোখ পড়িল? বুঝি তাই।'[১৮]

এছাড়াও উপন্যাসগুলি থেকে নিবর্তক জাদুবিশ্বাসের পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি উল্লেখ করা হল-

দুর্গেশনন্দিনী- পৃ ৭, ৯, ২৬, ৩০, ৮৬

বিষবৃক্ষ- পৃ ২১৫, ২৭৩

ইন্দিরা- পৃ ৩০৭, ৩১৬, ৩৫২

চন্দ্রশেখর- পৃ ৩৫৪, ৩৬২, ৩৬৩, ৩৬৪, ৩৮২, ৩৮৮, ৩৯০

রজনী- পৃ ৪৮২, ৪৯০

কৃষ্ণকান্তের উইল- ৫১৫, ৫১৬

রাজসিংহ- পৃ ৫৭৮, ৫৮৯, ৬০৫, ৬২৪, ৬২৮, ৬৪৪, ৬৫১, ৬৬১

আনন্দমঠ- পৃ ৬৭৫, ৬৯৯, ৭০৫, ৭২০

দেবী চৌধুরাণী- পৃ ৭৪৫, ৭৪৮, ৭৫০, ৭৫৩, ৭৫৮, ৭৬৯, ৭৭৪, ৭৮০, ৭৯৪, ৭৯৫, ৭৯৬, ৮২১

সীতারাম- পৃ ৮২৭, ৮২৯

ফেটিশ:

রাজসিংহ-

নির্মলকুমারী। "তরবারি ছুঁইয়া শপথ কর যে, আমাকে বিবাহ করিবে।"[১৯]

সীতারাম –

'ঘরে একটি শালগ্রাম ছিল,—এতটুকু ক্ষুদ্র একখানি নৈবেদ্য দিয়া প্রত্যহ তাহার একটু পূজা হইত। শ্রী ও শ্রীর মা জানিত যে, ইনিই সাক্ষাৎ নারায়ণ।'[২০]

এছাড়াও উপন্যাসগুলি থেকে ফেটিশের পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি উল্লেখ করা হল-

মৃণালিনী- পৃ ১৪৩

বিষবৃক্ষ- পৃ ২১৬, ২৩৩, ২৮২

চন্দ্রশেখর- পৃ ৩৬৪, ৩৯২, ৪২৩

রজনী- পৃ ৪৫৬, ৪৮১

রাজসিংহ- পৃ ৫৪৫, ৫৬৬, ৫৭৮, ৫৮৮, ৬০০, ৬১৯, ৬৩৮, ৬৫০

আনন্দমঠ- পৃ ৬৭৪, ৬৮৭, ৬৯২,৭২৭

দেবী চৌধুরাণী- পৃ ৭৯২, ৭৯৫, ৮১১, ৮১৬, ৮২২

সীতারাম– পৃ ৮৪২, ৮৪৬, ৮৬১, ৮৬২

ইন্দিরা- পৃ ২৯৮

শপথ:

দেবী চৌধুরাণী–

ব্রজেশ্বর। "তুমি আমার কাছে শপথ করিয়াছ, আমিও তোমার কাছে শপথ করিতেছি। আজ যদি তুমি প্রাণ রাখ, আমি তোমাকে আমার ঘরণী গৃহিণী করিব।"[২১]

ইন্দিরা –

উপেন্দ্র। "আমি শপথ করিতেছি, তুমি চিরকাল আমার হৃদয়েশ্বরী হইয়া থাকিবে।"[২২]

এছাড়াও উপন্যাসগুলি থেকে শপথের পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি উল্লেখ করা হল-

দেবী চৌধুরাণী– পৃ ৮২১

কৃষ্ণকান্তের উইল- পৃ ৪৯৮, ৫৫৮

রাজসিংহ- পৃ ৫৬৬, ৫৭৯

অদৃষ্টে বিশ্বাস:

দুর্গেশনন্দিনী –

জগৎসিংহ: 'যাহা অদৃষ্টে পশ্চাৎ ঘটিবে; বিধাতার লিপি কে খণ্ডাইবে?'[২৩]

কপালকুণ্ডলা –

১. নবকুমার: 'মনে মনে ভাবিলেন, "এও কপালে ছিল!"'[২৪]

২. কপালকুণ্ডলা। 'যাহা কপালে আছে, তাহাই ঘটিবে।'[২৫]

এছাড়াও উপন্যাসগুলিথেকে অদৃষ্টে বিশ্বাসের পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি উল্লেখ করা হল-

দুর্গেশনন্দিনী- পৃ ৩৩

কপালকুণ্ডলা- পৃ ১০১, ১১৫

চন্দ্রশেখর- পৃ ৩৭১

কৃষ্ণকান্তের উইল- পৃ ৫০৩, ৫৫৪

ইন্দিরা- পৃ ৩০৫, ৩২২

অলৌকিক জাদুক্ষমতায় বিশ্বাস:

আনন্দমঠ-

'শান্তি বলিল, "... এই মহাত্মাকে প্রণাম কর।"

তখন উভয়ে দেখিল, কেহ কোথাও নাই! কাহাকে প্রণাম করিবে?'[২৬]

এছাড়াও উপন্যাসগুলি থেকে অলৌকিক জাদুক্ষমতায় বিশ্বাসের পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি উল্লেখ করা হল-

আনন্দমঠ- পৃ ৭৪০, ৬৯০, ৭২২, ৭২২, ৭১৫

কপালকুণ্ডলা- পৃ ৯৯, ৯৭

মৃণালিনী- পৃ ১৫৪, ১৬৪, ১৮৫, ১৬৫, ১৫৮

বিষবৃক্ষ- পৃ ২২৩

চন্দ্রশেখর- পৃ ৩৮৩

রজনী- পৃ ৪৮৫, ৪৮৫, ৪৭৭, ৪৮২

কৃষ্ণকান্তের উইল- পৃ ৫০৭, ৫১৯

রাজসিংহ- পৃ ৬০৪, ৫৬৮

দেবী চৌধুরাণী- পৃ ৭৯৫, ৭৫৮, ৭৬১

সীতারাম- পৃ ৮৪৬, ৮৭১, ৮৮৬, ৮৯০, ৮২৭

ইন্দিরা- পৃ ৩৩২, ৩৩৪, ৩৩৫, ৩১৪

অভিশাপ ও আশীর্বাদে বিশ্বাস:

দুর্গেশনন্দিনী-

১. জগৎসিংহ। 'রাজপুতহৃদয়ে ব্রহ্মশাপের ভয় ভিন্ন অন্য ভয় প্রবল নহে;'[২৭]
২. অভিরাম স্বামীর জগৎসিংহের চিঠিতে-

"যদি ধর্ম্মভয় থাকে, যদি ব্রহ্মশাপের ভয় থাকে, তবে পত্র পাঠমাত্র এই স্থানে একা আসিবে।

ইতি

অহং ব্রাহ্মণঃ।”[২৮]

চন্দ্রশেখর–

সুন্দরী। “দেবতার কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, যেন মরিতে তোমার সাহস হয়! মুঙ্গেরে যাইবার পূর্ব্বেই যেন তোমার মৃত্যু হয়! ঝড়ে হোক্, তুফানে হোক্, নৌকা ডুবিয়া হোক্, মুঙ্গেরে পৌঁছিবার পূর্ব্বে যেন তোমার মৃত্যু হয়।”[২৯]

এছাড়াও উপন্যাসগুলি থেকে অভিশাপ ও আশীর্বাদে বিশ্বাসের পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি উল্লেখ করা হল-

দুর্গেশনন্দিনী– পৃ ৮৫,

চন্দ্রশেখর- পৃ ৩৬৫

কৃষ্ণকান্তের উইল- পৃ ৫৩৫

রাজসিংহ- পৃ ৫৭৯, ৬১৬

আনন্দমঠ- পৃ ৬৭৪, ৬৮৭, ৭২৮

জ্যোতিষে বিশ্বাস:

চন্দ্রশেখর-

‘মীরকাসেম হিন্দুদের নিকট জ্যোতিষশিক্ষা করিয়াছিলেন।’[৩০]

অর্থাৎ, কুয়াশা তখনও পুরোপুরি কাটেনি। তবুও তারই মাঝ থেকে বেশ ক’টি উপন্যাসে মাথা চারা দিয়ে উঠেছে প্রতিবাদী জিজ্ঞাসু আধুনিক চেতন-চিন্তন। যেমন, ‘কপালকুণ্ডলা’র নায়ক নবকুমার। সাগরসঙ্গমে তীর্থযাত্রীরা ‘পরকালের কর্ম’ করতে এলেও সে এসেছে অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে–“সমুদ্র দেখিব বড় সাধ ছিল, সেইজন্যই আসিয়াছি।”[৩১] পরকালমুখী প্রাচীনের ভিড়ে সে উল্টোস্রোতে–সে ইহকালমুখী।

"তান্ত্রিকেরা সকলই করিতে পারেন"[৩২] জেনেও নির্ভীক আত্মবিশ্বাসী যে নবকুমার যুক্তি আঁকড়ে স্থির থাকে–"পলাইব বা কেন?... কাপালিক মনুষ্য, আমিও মনুষ্য।"[৩৩] সে আর যাই হোক, গতানুগতিক চরিত্র হতে পারে না। এরপরে আসে 'মৃণালিণী'র কথা। ভূতযোনির অস্তিত্বে বিশ্বাসী হেমচন্দ্র। উপন্যাসের পশ্চাৎপটখানি 'পৌরাণিক ধর্ম্মের একাধিপত্যকালে' স্থাপন করে ঔপন্যাসিক নায়কের ভীরুতাদোষ ও অনাধুনিকতাকে আড়াল করার যেমন চেষ্টা করেছেন, পাশাপাশি কৌতূহল ও যাচাইয়ের প্রবণতা আরোপ করে তাকে আধুনিক বানানোর প্রয়াসেরও ত্রুটি করেননি। তুলনায়, স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেশ কয়েক ধাপ এগিয়ে এ উপন্যাসেরই পশুপতি চরিত্রটি—যে ট্যাবু-টোটেম প্রথা ভেঙে, শ্রোত্রিয় হয়ে, কুলীনকন্যাকে বিয়ে করতে চেয়েছে, বিধবাবিবাহে সমাজের বিপক্ষে দাঁড়ানোর সাহস জুটিয়েছে, আগাগোড়া সমস্ত দ্বিধা, সমস্ত প্রশ্নের মোকাবিলা করেছে যুক্তির বর্মে। এক পা এগিয়েছে চন্দ্রশেখরও—'শৈবলিনী প্রথামত স্বামীর অন্নব্যঞ্জন তাহার নিকট রক্ষা করিয়া, আপনি আহারাদি করিয়া পার্শ্বস্থ শয্যোপরি নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন। এ বিষয়ে চন্দ্রশেখরের অনুমতি ছিল'[৩৪] শুধু এটুকু নয়, তত্ত্বজ্ঞ, তত্ত্বজিজ্ঞাসু এই সত্যবাক্ পণ্ডিত জ্যোতিষশাস্ত্রের সীমাবদ্ধতার ইঙ্গিত দিতেও কুণ্ঠিত হয়নি—'সকল কথা গণনায় স্থির হয় না। যদি হইত, তবে মনুষ্য সর্বজ্ঞ হইত।'[৩৫] বঙ্কিম-উপন্যাসে আরেক ব্যতিক্রমী চরিত্র ডাক্তারি পড়া আধুনিকমনস্ক যুবক শচীন্দ্র—যে বিশ্বাস করে 'সকলই নিয়মাধীন'; বাবা-মায়ের বিশ্বাস সংস্কারের পথে নিশ্চিন্তে গা ভাসিয়ে না দিয়ে যে প্রশ্ন-তর্ক-যাচাইয়ের পরীক্ষা পেরিয়ে, তবেই যাবতীয় অ-লৌকিককে স্বীকৃতি দিতে সম্মত হয়—'দেখিলাম, সন্ন্যাসীর অনেক প্রকার ভণ্ডামি আছে। সন্ন্যাসী ঔষধ বিলায়, সন্ন্যাসী হাত দেখিয়া গণিয়া ভবিষ্যৎ বলে, সন্ন্যাসী যাগ হোমাদিও মধ্যে মধ্যে করিয়া থাকে,—নল চালে, চোর বলিয়া দেয়, আরও কত ভণ্ডামি করে। একদিন আমার অসহ্য হইয়া উঠিল। একদিন আমি তাহাকে বলিলাম, "আপনি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত; আপনার এসকল ভণ্ডামি কেন?

স। কোন্‌টা ভণ্ডামি?

আমি। এই নলচালা, হাতগণা প্রভৃতি।

স। কতকগুলা অনিশ্চিত বটে, কিন্তু তথাপি কর্ত্তব্য।

আমি। যাহা অনিশ্চিত জানিতেছেন, তদ্দ্বারা লোককে প্রতারণা কেন করেন?

স। তোমরা মড়া কাট কেন?

আমি। শিক্ষার্থ।

স। যাহারা শিক্ষিত, তাহারা কাটে কেন?

আমি। তত্ত্বানুসন্ধান জন্য।

স। আমরাও তত্ত্বানুসন্ধান জন্য এ সকল করিয়া থাকি। শুনিয়াছি, বিলাতী পণ্ডিতের মধ্যে অনেকে বলেন, লোকের মাথার গঠন দেখিয়া তাহার চরিত্রের কথা বলা যায়, তবে হাতের রেখা দেখিয়াই বা কেন না বলা যাইবে? ইহা আমি মানি যে, হাতের রেখা দেখিয়া, কেহ এ পর্য্যন্ত ঠিক বলিতে পারেন নাই। ইহার কারণ এই হইতে পারে যে, ইহার সঙ্কেত অদ্যপি পাওয়া যায় নাই, কিন্তু ক্রমে ক্রমে হাত দেখিতে দেখিতে প্রকৃত সঙ্কেত পাওয়া যাইতে পারে। এজন্য হাত পাইলেই দেখি।

আমি। আর নলচালা?

স। তোমরা লৌহের তারে পৃথিবীময় লিপি চালাইতে পার, আমরা কি নলটি চালাইতে পারি না? তোমাদের একটি ভ্রম আছে, তোমরা মনে কর যে, যাহা ইংরেজরা জানে, তাহাই সত্য, যাহা ইংরেজ জানে না, তাহাই অসত্য, তাহা মনুষ্যজ্ঞানের অতীত, তাহা অসাধ্য। বস্তুত তাহা নহে। জ্ঞান অনন্ত। কিছু তুমি জান, কিছু আমি জানি, কিছু অন্যে জানে, কিছু আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা জানিতেন। ইংরেজরা যাহা জানে, ঋষিরা তাহা জানিতেন না; ঋষিরা যাহা জানিতেন, ইংরেজরা এ পর্য্যন্ত তাহা জানিতে পারেন নাই। সেই সকল আর্য্যবিদ্যা প্রায় লুপ্ত হইয়াছে; আমরা কেহ কেহ দু একটি বিদ্যা জানি। যত্নে গোপন রাখি–কাহাকেও শিখাই না।

আমি হাসিলাম। সন্ন্যাসী বলিলেন, "তুমি বিশ্বাস করিতেছ না? কিছু প্রত্যক্ষ দেখিতে চাও?"

আমি বলিলাম, "দেখিলে বুঝিতে পারি।"'[৩৬]

জাদুবিশ্বাসকে যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে বিচার করার পাশাপাশি এ অংশে সন্ন্যাসীর উক্তিতে উপনিবেশোত্তর চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়—যেখান থেকে Eurocentric জ্ঞানকে একমাত্র জ্ঞান হিসেবে অস্বীকার করে বিকল্প জ্ঞানকে স্বীকৃতি দিচ্ছেন বঙ্কিম।

যাই হোক, যদিও বঙ্কিম-উপন্যাসে জাদুক্রিয়া ও জাদুবিশ্বাসের প্রতি অধিক দুর্বলতা দেখা গেছে প্রাচীন প্রজন্ম, নিম্নশ্রেণি আর মহিলাদের মধ্যে, তবুও শুধু পুরুষরাই নয়, আধুনিকতার উজ্জ্বল পোঁচ লেগেছে বঙ্কিমের বেশ কিছু নারীচরিত্রেও। এবিষয়ে প্রথমেই আনতে হয় ইন্দিরার কথা, ইন্দিরা—চিরাচরিত পাপপুণ্যের ধারণা যাকে ধাঁধিয়ে তুলেছে। ইন্দিরা যেখানে শুধু ভেবেই ক্ষান্ত হয়েছে, সেখান থেকে যাচাই করার দুঃসাহসে ভর করে অনেকখানি এগিয়ে গেছে শৈবলিনী—'শৈবলিনী, প্রথম প্রথম তৎকালের প্রচলিত প্রথানুসারে, ফষ্টরকে দেখিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে পলাইত। পরে কেহ তাহাকে বলিল, "ইংরেজেরা মনুষ্য ধরিয়া সদ্যভোজন করে না—ইংরেজ অতি আশ্চর্য্য জন্তু—একদিন চাহিয়া দেখিও।" শৈবলিনী চাহিয়া দেখিল—দেখিল, ইংরেজ তাহাকে ধরিয়া সদ্যভোজন করিল না। সেই অবধি শৈবলিনী ফষ্টরকে দেখিয়া পলাইত না—ক্রমে তাঁহার সহিত কথা কহিতেও সাহস করিয়াছিল।"[৩৭] পরবর্তী উপন্যাসে রাধারাণীকে তো অনেকটা 'মেম'ই বানিয়ে দিয়েছেন ঔপন্যাসিক—সমাজের ট্যাবু ভেঙে সে শুধু অচেনা পুরুষের সামনে বেরই হয় না, তার সঙ্গে আলাপ করে, এমনকি দ্বিধা দ্বন্দ্ব কাটিয়ে একরকম বিয়ের প্রস্তাবও দিয়ে ফেলে। এসব ব্যতিরেকে, আবহমান কাল ধরে চলে আসা সমস্ত ধ্যানধারণার সামনে বিনা প্রশ্নে নতি স্বীকার না করে কৈফিয়ৎ দাবী করে বসেছে বঙ্কিমের অনেক নায়িকাই। একদিকে জন্মান্ধ রজনী যেমন দেবতার 'দেবত্ব' সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছে, দরিয়া খুঁজেছে ঈশ্বরের কাজের যৌক্তিকতা, আর স্বামীপরিত্যক্তা ভ্রমর সিদ্ধান্ত করেই নিয়েছে—"দেবতারা নিতান্ত নিষ্ঠুর।"[৩৮] কিন্তু এদের সবাইকে ম্লান করে ছাপিয়ে উঠেছে রোহিণী—আগাগোড়া সে বেয়ারার মতো ঘাড় শক্ত

করে থেকেছে, হার মানেনি: "কি অপরাধে এ বালবৈধব্য আমার অদৃষ্টে ঘটিল? আমি অন্যের অপেক্ষা এমন কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি যে, আমি এ পৃথিবীর কোন সুখভোগ করিতে পারিলাম না। কোন্ দোষে আমাকে রূপ যৌবন থাকিতে কেবল শুষ্ক কাষ্ঠের মত ইহজীবন কাটাইতে হইল? যাহারা এ জীবনের সকল সুখে সুখী—মনে কর, ঐ গোবিন্দলাল বাবুর স্ত্রী—তাহারা আমার অপেক্ষা কোন্ গুণে গুণবতী—কোন্ পুণ্যফলে তাহাদের কপালে এ সুখ—আমার কপালে শূন্য? দূর হৌক—পরের সুখ দেখিয়া আমি কাতর নই—কিন্তু আমার সকল পথ বন্ধ কেন?"[৩৯] রোহিণী কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার অতৃপ্তির জীবনকে 'অদৃষ্ট' বলে নিরাশ হয়নি, পাপ-পুণ্য-কর্মফলের গোঁজামিলে ভুলেও থাকেনি, বরং নিজের ভাগ্যকে সে নিজের হাতেই গড়ে নিতে চেয়েছে। বেপরোয়া এই নারী 'পুরুষ'-অনুক্রমে ব্যবহৃত স্তোকবাক্যকে আঘাত করে এগিয়ে গেছে অনায়াসে—"আমি পাপ পুণ্য মানি না—কোন্ পাপে আমার এই দণ্ড? পাপ না করিয়াও যদি এই দুঃখ, তবে পাপ করিলেই বা ইহার বেশী কি হইবে?"[৪০] ধরে বেঁধে দেওয়া জীবনে বন্দী থাকেনি শান্তিও। 'মেয়েদের এসব করতে নেই' আর 'মেয়েদেরকেই এসব করতে হয়'-এর ট্যাবু ভেঙ্গে বেরিয়ে এসেছে সে; নির্ভীক প্রশ্নে জানতে চেয়েছে—"স্ত্রী-বাহুতে কি কখন বল থাকে না?"[৪১]

এই আধুনিকতার দৌড়ে ব্রাত্য থাকে না উপন্যাসের ছোটোখাটো অপ্রধান চরিত্রগুলিও। সে ভিড় থেকে উদাহরণ হিসেবে উঠে আসতে পারে 'রাধারাণী' উপন্যাসের উকিল কামাখ্যাবাবুর কথা—'কামাখ্যাবাবু নব্যতন্ত্রের লোক—বাল্যবিবাহে তাঁহার দ্বেষ ছিল। তিনি বিবেচনা করিলেন যে, রাধারাণীর বিবাহ তাড়াতাড়ি না দিলে, জাতি গেল মনে করে, এমত কেহ তাহার নাই। অতএব যবে রাধারাণী, স্বয়ং বিবেচনা করিয়া বিবাহে ইচ্ছুক হইবে, তবে তাহার বিবাহ দিব। এখন সে লেখাপড়া শিখুক।'[৪২] 'ইন্দিরা' উপন্যাসের রমণবাবু, কিংবা, 'রজনী' উপন্যাসের অমরনাথের কথা। অন্ধ রজনীর অলৌকিক উপায়ে চক্ষুদান প্রসঙ্গে যে বলেছে—"না দেখিলে, আমি ইহা বিশ্বাস করিতাম না। ইউরোপীয় চিকিৎসাশাস্ত্রানুসারে ইহা অসাধ্য।"[৪২]

এ তো গেল চরিত্রের কথা; চরিত্রের মধ্যে দিয়ে ঔপন্যাসিকের কথা। কিন্তু চারিত্রিক মুখোশ ধার না করেও বঙ্কিম তাঁর উপন্যাসে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিকে মেলে ধরেছেন: সে লরেন্সের ঈশ্বর-স্মরণের কারণে হোক—'কেহ বিস্মিত হইও না। যে ঈশ্বর না মানে, সেও বিপদে পড়িলে তাঁহাকে ডাকে—ভক্তিভাবে ডাকে। ফষ্টরও ডাকিল।'[৪৩] বা, শৈবলিনীর নরকদর্শনের যুক্তিতে। 'বিকৃতি' আর 'দিব্য চক্ষু'র মধ্যে রেখ নির্মাণে হোক, কিংবা, অন্ধবিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে সেন-রাজাকে ঠকিয়ে পশুপতির কাজ হাসিলে। 'মৃণালিনী'তে যখন বঙ্কিম পণ্ডিত মাধবাচার্যের জ্যোতিষ গণনার ভ্রান্তি ও সীমাবদ্ধতা তুলে ধরেন, দেখান জ্যোতিষে পারদর্শী মাধবাচার্য্য প্রিয় শিষ্য হেমচন্দ্রের বিবাহের পূর্ব এবং পশ্চাদাভাস পর্যন্ত জানতে অসমর্থ; যখন বঙ্কিম সন্ন্যাসীর 'অলৌকিক' ওষুধে শচীন্দ্রের অস্বাভাবিক ব্যামোর 'লৌকিক' ব্যাখ্যা দান করেন, কিংবা যখন নিজের বক্তব্যের উৎস সন্ধানে বঙ্কিম প্রাচ্যের শাস্ত্র তুলে আনেন আর প্রাচ্যের বিশ্বাসকে অভ্রান্ত প্রমাণের চেষ্টায় নিজের সমর্থনে টেনে আনেন পাশ্চাত্যের বিশ্বাসকে তখন খুব স্বাভাবিকভাবেই উপন্যাসের পরতে পরতে ঝকঝক্ করে ওঠে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত, আধুনিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ এক অনন্য বঙ্কিম।

তবুও, কোথাও কোথাও এই হিসেবী বঙ্কিমও পা ফেলতে ভুল করে ফেলেছেন—শিকড়ের প্রতি টানটাকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করে বেরিয়ে আসতে পারেননি; যুক্তি-বুদ্ধির ওপর আধিপত্য করে তখন প্রধান হয়ে উঠেছে তাঁর বিশ্বাস—অন্ধবিশ্বাস। অনুসন্ধিৎসু শৈবলিনীকে অবলীলায় তিনি 'নষ্ট'-এর তালিকায় নামিয়েছেন, আশমানির বৈধব্যের জন্য দায়ী করেছেন তার 'কপালের লিখন দোষ'-কে, অনাচারী ব্রাহ্মণ গজপতি বিদ্যাদিগগজকে শাস্তি দিয়েছেন তার 'জাত মেরে', ভ্রান্ত গণক মাধবাচার্য্যের মুখ দিয়ে বলিয়ে নিয়েছেন—"জ্যোতিষ গণনা মিথ্যা হইবার নহে; অবশ্য সফল হইবে। তবে আমার এক ভ্রম হইয়া থাকিবে।"[৪৪] নব্য আধুনিক যুবকদের ঈশ্বর না মানার কারণ হিসেবে বিদ্রূপ করেছেন তাদের 'ক্ষুদ্র বিচারশক্তি'কে। অন্যদিকে, বিজ্ঞানের সূত্র ভ্রষ্ট হয়ে সম্মোহনের বৈজ্ঞানিক প্রয়োগের থেকে বঙ্কিম অনেক বেশি ক্ষমতা দিয়ে ফেলেছেন রমানন্দ স্বামীর কমণ্ডলুস্থিত মন্ত্রপূত জলকে—তাই 'লৌকিক' সম্মোহনে যা অসম্ভব,

সম্ভব হয়ে উঠেছে শৈবলিনীর 'অলৌকিক' সম্মোহনে; সম্মোহিত শৈবলিনী চন্দ্রশেখরকে সেইসব কথা জানিয়েছে, যা স্বাভাবিকভাবে তার নিজেরই জানার কথা নয়। একইরকম অবিশ্বাস্য কুন্দনন্দিনীর প্রথম স্বপ্নদর্শনে সম্পূর্ণ অপরিচিত নগেন্দ্র ও হীরাকে দেখার ঘটনা, যেখানে মনস্তত্ত্ব বলে, অভিজ্ঞতার অতীত বস্তুকে স্বপ্নে দেখা সম্ভব নয়; একইরকম মর্মভেদী বাস্তবমুখিন দুঃসাহসী চরিত্র রোহিণীর প্রতি নীতিবাগীশ বঙ্কিমের নির্মম কলমের খোঁচা—'তা, আমরা ত বলিয়াছি, রোহিণী লোক ভাল নয়।'[৪৫] একইরকম হতাশাব্যঞ্জক নব্য প্রজন্মের প্রতিনিধি আধুনিকমনস্ক শচীন্দ্রের পরিণতি—হাজারও প্রশ্ন-তর্ক-যাচাইয়ের পর এই ব্যতিক্রমী চরিত্রটিকেও শেষ পর্যন্ত মাথা নোয়াতে বাধ্য করা হয়েছে 'অলৌকিকতা'র সামনে, উপন্যাসশেষে তাকেও ভিড়িয়ে দেওয়া হয়েছে গড্ডালিকা প্রবাহে। স্বাবলম্বী মহেন্দ্রকেও জোর করে পরনির্ভরশীল, অলৌকিক-প্রত্যয়ী করে তুলেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। যে মহেন্দ্রের মুখ দিয়ে ঔপন্যাসিক ফ্রয়েডের স্বপ্নতত্ত্ব আওড়াচ্ছেন, যে মহেন্দ্র সত্যানন্দের 'মহামন্ত্র' 'মহাব্রত'-এর আহ্বান বিরক্তিভরে সরিয়ে দিয়েছে, যে মহেন্দ্র সত্যানন্দের 'অলৌকিক শক্তি'তে জ্ঞাত তথ্যে 'বড় বিশ্বাস করিলেন না; বলিলেন, "আপনি কি প্রকারে জানিলেন? আপনি ত বরাবর আমার সঙ্গে।"'[৪৬], যে সত্যানন্দকে পরীক্ষা করতেও পিছ-পা নয়, তালেগোলে, গোঁজামিলে তাকেও স্বীকার করতে হয়েছে, সত্যানন্দ 'নিশ্চিত সিদ্ধ পুরুষ'।[৪৭]

আসলে এদেশীয় মাটি আর বিদেশীয় জলহাওয়া— দু'য়ের মাঝে পড়ে বঙ্কিম যতটা পিছিয়েছেন বা এগিয়েছেন, বিদীর্ণ হয়েছেন তার থেকে বহুগুণ অধিক। কারণ দু'য়ের মধ্যে থেকে 'মঝ্ ঝিম্' বের করাটা ছিল সেসময় অত্যন্ত দুরূহ। সে দ্বন্দ্বই তাঁর উপন্যাসের কাহিনি, চরিত্র ও আবহ জুড়ে।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়(১৮৪৭-১৯১৯):

অন্যদিকে সেদিন ত্রৈলোক্যনাথ হেঁটেছিলেন ভিন্ পথে। তিনি যেন আরও শক্ত করে শিকড় বিছিয়ে আঁকড়াতে চেয়েছিলেন, আগলাতে চেয়েছিলেন মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ঐতিহ্যের মাটিটাকে। 'ত্রৈলোক্যনাথ মনে করেছিলেন ভারতীয়

সাহিত্যের যে সুপ্রাচীন ঐতিহ্য আছে, আছে দেশজতা ও লৌকিকতার এক পরিপুষ্ট ধারা আধুনিক সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে সেটি নিতান্ত উপেক্ষণীয় নয়। অর্থাৎ আমাদের ঐতিহ্য থেকেই ক্রমবিবর্তনের পথে গড়ে উঠতে পারে আধুনিকতা; এর জন্যে পরের দ্বারে মাধুকরীবৃত্তির প্রয়োজন নেই। ত্রৈলোক্যনাথের সাহিত্য-ভাবনা ছিল সে যুগের পক্ষে এক মূর্ত প্রতিবাদ।'[৪৮] কিন্তু বর্ণাশ্রম প্রথা বা হিন্দুর সনাতন আদর্শ নিয়ে তিনি আদৌ বাতিকগ্রস্ত ছিলেন না।[৪৯] তাজা একঝলক পশ্চিমী হাওয়া তাঁর চারপাশের দমবন্ধ দুনিয়াটাকে ওলটপালট করে দিয়েছিল মুহূর্তে। জীবনের প্রান্তভাগে পৌঁছে সাহিত্যের মধ্যে দিয়েই সমাজের কোণায় কোণায় তিনি পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন উত্তরণের মূলধন।

ভ্রান্তপথে ঠেলে দেওয়া অজস্র জাদুবিশ্বাস এবং সেগুলোকে ব্যবহার করে লোক-ঠকানো, ধূর্ততা, ভণ্ডামির ফাঁসে সেদিন ক্রমশ পাণ্ডুর নিস্পন্দ হয়ে পড়ছিল এ সমাজ।

সংস্পর্শমূলক জাদুবিশ্বাস:

কঙ্কাবতী(১৮৯২)-

১. 'গোবর্দ্ধন শিরোমণি বলিলেন,—"ক্ষেত্রচন্দ্র মদ খান, কি না খান, তাহা আমি জানি না। তবে তিনি যে যবনের জল খান, তাহা জানি। গদাধর ঘোষ ইহা স্বচক্ষে দেখিয়াছে।"'[৫০]

২. গোবর্দ্ধন। "সাহেবের জল পান করিয়া অবশ্যই তিনি সাহেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই!"[৫১]

এছাড়াও উপন্যাসটি থেকে সংস্পর্শমূলক জাদুবিশ্বাসের পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি উল্লেখ করা হল- পৃ ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭১, ৭২, ৭৩

শুক্ল জাদুবিশ্বাস—

প্রবর্তক জাদুবিশ্বাস:

কঙ্কাবতী(১৮৯২)-

'খেতুর মা, খেতুর কপালে দধির ফোঁটা দিলেন, চাদরের খুঁটে বিল্বপত্র বাঁধিয়া দিলেন।'[৫২]

ফোক্‌লা দিগম্বর(১৯০২)-

'বিয়ের দিন ফোক্‌লা দিগম্বরের 'হাতে পাথর বসান যাঁতি।'[৫৩]

পাপের পরিণাম(১৯০৮)-

১. 'গত বৎসর রক্ষাকালীর পূজা করিয়া গ্রামের লোক শাঁকচুন্নির হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিল। এ বৎসরও তাহারা রক্ষাকালীর পূজা করিল! কালীর কৃপায় এবৎসর ভাদ্রমাসে খাঁদাভূত একেবারেই আসিল না! গ্রামের লোকের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। সকলে বলিল,—'রক্ষাকালী জাগ্রত দেবতা। ভূত-প্রেত সকলেই তাঁহাকে ভয় করে। তাঁহার কৃপায় খাঁদা ভূতের হাত হইতে আমরা পরিত্রাণ পাইলাম।'[৫৪]
২. 'দূর হইতে পুঁটুলি তিনটির উপর অনেক শুষ্ক খড় নিক্ষেপ করিয়া অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করা হইল। তাহা যেন হইল। কিন্তু যুধিষ্ঠির ঘোষের পুত্র হেরম্ব পুঁটুলির উপর যে পা রাখিয়াছিল, এখন তাহার উপায় কি? সকলে বলিল যে, সে আর কিছুতেই রক্ষা পাইবে না!...

ভাগ্যে গ্রামে গৌরবিণী নামে এক বৃদ্ধা তিওরণী ছিল। সেকালে যখন ডাইনীর উপদ্রব অতিশয় প্রবল ছিল, তখন গৌরবিণী তাহার দিদিমায়ের নিকট হইতে অনেকগুলি আড়াই অক্ষরের মন্ত্র ও অনেকগুলি ঔষধ শিখিয়া রাখিয়াছিল। তুকের জনরব ও কান্নার রোল শুনিয়া লাঠি ধরিয়া ঠুক্ ঠুক্ করিতে করিতে গুড়ি গুড়ি গৌরবিণী বুড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল। 'ভয় নাই, ভয় নাই, আমি ছেলেকে বাঁচাইব,' এই বলিয়া সকলকে সে আশ্বাস প্রদান করিল। তাহার পর হেরম্বের নিকট বসিয়া সে ঝাড়-ফুঁক আরম্ভ করিল। মন্ত্র ও ফুৎকারের প্রভাবে বালক উঠিয়া বসিল।

গৌরবিণী বলিল যে, রাম-কবচের কর্ম নহে। এ ভূত নহে যে রামকবচকে ভয় করিবে ইহাকে যাদু বলে। অবশেষে সে ঔষধিসম্বলিত একটি নেকড়ার পুঁটুলি অর্থাৎ মাদুলি বালকের গলায় পরাইয়া দিল। তাহা পরিধান করিয়া বালক সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইল। গ্রামের লোক ভাবিল যে, গৌরবিণী অসাধ্য সাধন করিল, বলিতে গেলে মরা মানুষকে প্রাণদান করিল। সকলে তাহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।'[৫৫]

৩. 'গ্রামের লোক অতি সাবধানে সে সমুদয় তুক পোড়াইয়া ফেলিল। এখানে পা ফেলিয়া, সেখানে পা ফেলিয়া, অতি সন্তর্পণে সকলে পথ চলিতে লাগিল।'[৫৬]

৪. 'গৌরবিণী বলিল যে, যেমন তুক্‌তাক্ গুণ-জ্ঞান হউক না কেন তাহারা সেই নেকড়ার পুঁটুলি অর্থাৎ মাদুলি গলায় পরিধান করিয়া সে তুক্ মাড়াইলে অথবা ডিঙ্গাইলে কিছুমাত্র অনিষ্ট হইবে না।'[৫৭]

এছাড়াও উপন্যাসগুলি থেকে প্রবর্তক জাদুবিশ্বাসের পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি উল্লেখ করা হল-

কঙ্কাবতী(১৮৯২)- পৃ ৩৯, ৪০, ৪৯, ৫১, ৫৭, ৭১

ফোক্‌লা দিগম্বর(১৯০২)- পৃ ২০০, ২২২, ২২৪, ২২৫, ২৫৮, ২৬৬, ২৭৭, ২৮৮

পাপের পরিণাম(১৯০৮)- পৃ ৩০০, ৩০২, ৩০৪, ৩০৯, ৩১৭, ৩২৬, ৩২৯, ৩৩৯, ৩৪১, ৩৪২, ৩৪৯, ৩৬৬-৬৭, ৩৭৩, ৪৪২, ৪৪৮, ৩৩৩

নিবর্তক জাদুবিশ্বাস:

ফোকলা দিগম্বর(১৯০২)-

১. 'দিগম্বরবাবু পুনরায় চীৎকার করিয়া বলিলেন, "ঐঃ। শীগ্‌গির আয়! লগ্ন ভস্ম হঁয় যেঁ রে"'[৫৮]

২. দিগম্বরকে 'গলা-ভাঙা উত্তর করিলেন,— "তোর বে নয়? তবে তোর হাতে সূতা বাঁধা কেন রে ড্যাক্‌রা?"'[৫৯]

কৃষ্ণ জাদুবিশ্বাস:

কঙ্কাবতী(১৮৯২)-

'গ্রামে ডাইনীরও অপ্রতুল নাই। পিতামহী-মাতামহীগণ বালক-বালিকাদিগকে সাবধান করিয়া দেন,— "ডাইনীরা পথে 'কুটা' হইয়া পড়িয়া থাকে, সে তৃণ যেন মাড়াইও না, তাহা হইলে ডাইনীতে খাইবে।"'[৬০]

পাপের পরিণাম(১৯০৮)-

১. 'একদিন প্রাতঃকালে যুধিষ্ঠির ঘোষের পঞ্চমবর্ষীয় পুত্র হেরম্ব, পথে একটি নেকড়ার অর্থাৎ ছিন্ন বস্ত্রের পুঁটুলি মাড়াইয়া ফেলিল। পথে তিনটি পুঁটুলি পড়িয়াছিল। যে-সে পথ নহে, তিন মাথার পথ, অর্থাৎ তিনটি গ্রাম্য পথ এই স্থান হইতে তিন দিকে গিয়াছিল। লোকে ভাবিয়া দেখিল যে গত রাত্রি শনিবারের রাত্রি ছিল। গ্রামের বিজ্ঞ লোকেরা আসিয়া পুঁটুলি তিনটি দূর হইতে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল। ভয়ে তাহারা হতভম্ব অবাক্ হইয়া রহিল! বলিবে আর ছাইভস্ম কি! এ ঘোর সর্বনাশের কথা বাক্য দ্বারা প্রকাশ করিয়া বলিতে পারা যায় না। সেজন্য অতি গম্ভীরভাবে দুই চারিবার ঘাড় নাড়িয়া তাহারা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল।

কিন্তু গ্রামের লোক নির্বোধ নহে। বুঝিতে আর কিছু বাকী রহিল না। উহাকে তুক্ বা গুণ বলে। অতি সাংঘাতিক তুক্! এ তুক্ মাড়াইলে বা ডিঙ্গাইলে আর রক্ষা নাই। গ্রামের লোকের এরূপ সর্বনাশ কে করিয়াছে, তাহাই কি আর বুঝিতে বাকী থাকে? কাহার অনেক টাকা আছে? মরণাপন্ন-রোগগ্রস্ত হইয়া কে বিছানায় পড়িয়া আছে? কে তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছে? বড়ালমহাশয়কে সকলে ছি ছি করিতে লাগিল।...

ক্রন্দনের কোলাহলে গ্রাম পরিপূর্ণ হইল। বালক হেরম্ব তৎক্ষণাৎ শয্যাশায়ী হইয়া পড়িল। মুখ দিয়া তাহার কথা বাহির হয় না, দেখিতে দেখিতে সে দুর্বল হইয়া পড়িল। রোগ নহে যে, ডাক্তার-বৈদ্য আসিয়া চিকিৎসা করিবে।'[৬১]

২. ‘বুধবার দিন প্রাতঃকালে সকলে দেখিল যে, গ্রামের কোন পথে কতকগুলি ছেঁড়া চুল, কোন পথে সিন্দুর, কোন পথে কানা-কড়ি পড়িয়া আছে। দুর্বৃত্ত যাদুকর মঙ্গলবার রাত্রিতে এইরূপ গুণ করিয়াছিল।’[৬২]

৩. মাতুঠাকুরাণী ওরফে মাতঙ্গিনী: ‘একদিন প্রাতঃকালে তিনি উঠিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার দ্বারে একটি শুষ্ক শুভ্রবর্ণের গরুর মাথা পড়িয়া রহিয়াছে। সর্বনাশ! মাথায় আবার সিন্দুর! গ্রামের লোক দলে দলে আসিয়া তাঁহার দ্বারে দাঁড়াইল। কিন্তু এ যে কিরূপ গুণ, কেহ তাহা ভাল বুঝিতে পারিল না। অবশেষে ধনুকধারী আসিয়া ইহার প্রকৃত অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া দিল।’ [৬৩]

এছাড়াও উপন্যাসটি থেকে কৃষ্ণজাদুবিবিশ্বাসের পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি উল্লেখ করা হল-পৃ ৩৩৯, ৩৪০,

ফেটিশ:

ফোকলা দিগম্বর(১৯০২)-

কুসুম। ‘কাশীতে কোন দোষ নাই। সেজন্য আমি বাবুর সহিত বেড়াইতে আসিয়াছিলাম।’[৬৪]

পাপের পরিণাম(১৯০৮)-

বেণী। ‘মানুষের নাক। সোনা দিয়া বাঁধাইয়াছি। তুমি সর্বদা গলায় পরিধান করিবে। তোমার ভালো হইবে’।[৬৫]

এছাড়াও উপন্যাসগুলি থেকে ফেটিশের পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি উল্লেখ করা হল-

কঙ্কাবতী(১৮৯২)- পৃ ৩৬, ৪৬, ৪৮, ৬১, ৬২, ৬৭, ৬৯, ৭৩

ফোকলা দিগম্বর(১৯০২)- পৃ ২০৩, ৩০২, ৩১৫

টোটেম প্রথা/বর্ণাশ্রম প্রথায় বিশ্বাস:

ফোক্‌লা দিগম্বর(১৯০২)-

'রামপদ কলিকাতায় থাকিয়া কলেজে বিদ্যা অধ্যায়ন করে।' তবুও, রামপদ। "যদি এক গোত্র না হইত, তাহা হইলে আমি নিজেই কুসীকে বিবাহ করিতাম।"[৬৬]

পাপের পরিণাম-

১. 'রায়-গৃহিণী ভাবিলেন,—... আমি দেখিতেছি যে, ইহাদের দুইজনে প্রণয় হইয়াছে। তাহা ভাল নহে। যুবক ব্রাহ্মণ বটে। কিন্তু ইহার পরিচয় আমি জানিনা। সুবালার বাপ কিরূপ ব্রাহ্মণ, কুলীন না বংশজ, তাহা আমি জানি না।'[৬৭]

এছাড়াও উপন্যাসগুলি থেকে টোটেম প্রথা/বর্ণাশ্রম প্রথায় বিশ্বাসের পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি উল্লেখ করা হল-

ফোক্‌লা দিগম্বর(১৯০২)- পৃ ২৪১

পাপের পরিণাম- পৃ ২৪২, ৩৩২, ৩৩৩, ৩৪৮, ৩৪৯, ৩৮০, ৩৯৬-৯৭

অলৌকিক জাদুক্ষমতায় বিশ্বাস:

ফোক্‌লা দিগম্বর(১৯০২)-

১. দিগম্বর: 'সন্ন্যাসীকে দেখিয়া এখন তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"ভাল হইয়াছে যে, এই সন্ন্যাসীঠাকুর আসিয়াছেন। কন্যাকে তিনি এখনই ভাল করিবেন। ডাক্তারবাবু কিছু মনে করিও না। এখন তুমি সরিয়া যাও, ডাক্তারি চিকিৎসা আর আমি করাইব না। আমি ইহাকে কোলে লইয়া বসি। সন্ন্যাসীঠাকুর দূরে বসিয়া ঝাড়-ফুঁক করিবেন।'[৬৮]

২. 'বরযাত্রী উত্তর করিলেন,—"কন্যা এখন বেশ আছে। একবার সন্ন্যাসী তাহার কানে কানে কি বলিলেন, তাহাতে তাহার মুখে একটু হাসিও দেখিয়াছিলাম। রসময়বাবু তাহাকে এখন বাটীর ভিতর লইয়া গিয়াছেন। সন্ন্যাসীও বাটীর ভিতর গিয়াছিলেন।

শুনিলাম যে, কন্যা শুড়-শুড় করিয়া তাহার সহিত অনেক কথোপকথনও করিয়াছিল। সন্ন্যাসীর ক্ষমতা আছে বলিতে হইবে।"'[৬৯]

এছাড়াও উপন্যাসে অলৌকিকে বিশ্বাসের পৃষ্ঠাসংখ্যা উল্লেখ করা হল— পৃ ২৮৭

অশরীরীতে বিশ্বাস:

পাপের পরিণাম(১৯০৮)-

'পথে একটি হেলা বেলগাছ হইতে 'খুপ' করিয়া তাহার হাত হইতে পাঁঠার বাটিটি তুলিয়া লইল। ভয়ে আঁউ-মাউ করিয়া সে রুদ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল ও কিছুদূর গিয়া একেবারে অজ্ঞান হইয়া পড়িল।... সে রাত্রিতে বেলগাছের দিকে যাইতে কেহ সাহস করিল না। পরদিন প্রাতঃকালে সকলে দেখিল যে, বেলতলায় কাঁসার বাটিটি পড়িয়া আছে। মাংসটুকু ভূত চাটিয়া-পুটিয়া খাইয়াছে।'[৭০]

কঙ্কাবতী(১৮৯২)-

'একে বন্য দেশ, তাহাতে আবার এইরূপ শত শত অপঘাত মৃত্যু! সে স্থানে ভূতের অভাব হইতে পারে না। অশ্বত্থ, বট, বেল প্রভৃতি নানা গাছে নানা প্রকার ভূত আছে, সেখানকার লোকের এইরূপ বিশ্বাস। সন্ধ্যা হইলে, ঘরে বসিয়া, লোকে নানারূপ ভূতের গল্প করে, সেই গল্প শুনিয়া বালক বালিকার শরীর শিহরিয়া উঠে।'[৭১]

এছাড়াও উপন্যাসগুলি থেকে অশরীরীতে বিশ্বাসের পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি উল্লেখ করা হল-

কঙ্কাবতী(১৮৯২)- পৃ ৩৬

পাপের পরিণাম(১৯০৮)- পৃ ৩০২, ৩০৪, ৩০৫, ৩০৬, ৩০৭, ৩০৯, ৩১২-১৩, ৩১৪, ৩১৭, ৩২৪, ৩২৬, ৩২৭, ৩৫৬, ৩৬৩, ৩৭৪, ৩৭৮-৮২, ৪১৭-১৮, ৪১৯, ৪২৮, ৪৩৮

শুভ-অশুভ লক্ষণে বিশ্বাস:

ফোক্‌লা দিগম্বর(১৯০২)-

রসময়বাবু। "কি কুক্ষণে আজ রাত্রি প্রভাত হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। চাকরীর স্থানে আমার অপমানের আর সীমা রহিল না।"[৭২]

কঙ্কাবতী(১৮৯২)-

রামহরি। "বুধবার দিন ভাল। সেই দিন খেতুকে কলিকাতায় লইয়া যাইব।"[৭৩]

এছাড়াও উপন্যাসটি থেকে শুভ-অশুভ লক্ষণে বিশ্বাসের পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি উল্লেখ করা হল-

ফোক্‌লা দিগম্বর(১৯০২)- পৃ ৩০৫, ৩০৬, ৩০৮, ৩০৯, ৩১৭, ৩১৮, ৩১৯, ৩২৪, ৩২৬, ৩২৮, ৩৪৯, ৪৪৪

শপথে বিশ্বাস:

ফোক্‌লা দিগম্বর(১৯০২)-

কথক। 'মনে মনে কহিলাম,—"কি পাগল আমি যে, এই রাত্রিতে পুনরায় এতদূর আসিতে অঙ্গীকার করিয়া বসিলাম।"

যাহা হউক, যখন অঙ্গীকার করিয়াছি, তখন তাহা করিতেই হইবে।'[৭৪]

পাপের পরিণাম(১৯০৮)-

বড়ালমহাশয়। 'রাজাবাবুর নিকট শপথ করিয়াছিলাম যে, তাঁহার ঘরের কথা কাহাকেও আমি বলিব না। কিন্তু খাঁদা ভূতের দৌরাত্ম্যে যখন আমাদের প্রাণ লইয়া টানাটানি হইতেছে, তখন অগত্যা আমাকে বলিতে হইল।'[৭৫]

এছাড়াও উপন্যাসটি থেকে শপথে বিশ্বাসের পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি উল্লেখ করা হল-

ফোক্‌লা দিগম্বর(১৯০২)- পৃ ২২৬, ২৪৬, ২৭৯

পাপের পরিণাম- পৃ ৩১২, ৩২২, ৩৩৬

অভিশাপে বিশ্বাস:

কঙ্কাবতী(১৮৯২)-

গদাধর। "নিশিরাম ভাগ চাহিলেন। আমরা বলিলাম,— "এ কাজে তোমাকে কিছু করিতে হয় নাই, তোমাকে আমরা ভাগ দিব কেন?" কথায় কথায় কমলের সহিত নিশিরামের ঘোরতর বিবাদ করিয়া উঠিল; ক্রমে মারামারি হইবের উপক্রম হইল। কমল পৈতা ছিঁড়িয়া নিশিরামকে শাপ দিলেন। কমল ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ। সাক্ষাৎ অগ্নিরূপ। শিষ্য যজমান আছে। সেরূপ ব্রাহ্মণের অভিশাপ ব্যর্থ হইবার নহে। পাঁচ-সাত বছরের মধ্যেই মুখে রক্ত উঠিয়া নিশিরাম মরিয়া গেল। যাহা হউক, সেই সব কাপড় হইতে একজোড়া ভাল গরদের কাপড় আমরা শিরোমণি মহাশয়কে দিয়াছিলাম।"[৭৬]

এছাড়াও উপন্যাসগুলি থেকে অভিশাপে বিশ্বাসের পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি উল্লেখ করা হল-

কঙ্কাবতী(১৮৯২)- পৃ ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪১, ৪৫, ৪৯, ৫০, ৫৩, ৫৪, ৬২, ৬৩, ৭০

ফোক্‌লা দিগম্বর(১৯০২)- পৃ ২২২, ২৩০-৩১, ২৯৫, ৩১০, ৩১৯, ৩৩৭-৩৮, ৩৭৫, ৩৭৭, ৪০৪-৪০৫, ৪২৯-৩২

পাপের পরিণাম- পৃ ৩১০, ৩২৬, ৩৩৮, ৩৮০, ৪১৩-১৭

ত্রৈলোক্যনাথ কিন্তু 'উনিশ শতকের এই হঠাৎ জাগা হিন্দুয়ানির বাড়াবাড়িকে সমর্থন করেননি, বরং রঙ্গকৌতুকের দ্বারা তাকে নাস্তানাবুদ করেছেন'[৭৭] উপন্যাসে। এসবের পাশাপাশি, ঊনবিংশ শতাব্দীতে যখন দীর্ঘ নীরবতা ভেঙে অজস্র 'কী', 'কেন', 'কীভাবে'রা ছিটকে আসছিল, আর সেসবের উত্তর খুঁজতে খুঁজতে 'মিথ্যে'গুলোকে নাকোচ করে, 'সত্য'-এর গায়ে দেগে দেওয়া হচ্ছিল বৈধতার শীলমোহর, ত্রৈলোক্যনাথও তখন যুক্তি-তর্ক-বিচার-পরীক্ষা-প্রমাণ-কার্য-কারণের বৈজ্ঞানিক সূত্র ধরে নিজের মতো করে উপন্যাসগুলিতে স্পষ্ট করে তুলছিলেন বাস্তব-অবাস্তবের ভেদরেখাটাকে। যেমন, 'পাপের পরিণাম' উপন্যাসে ভূত আর শাঁকচুন্নির রহস্যের লৌকিক মীমাংসা, ধনুকধারীর ব-কলমে হিন্দুধর্মের সংকীর্ণতা নিষ্ঠুরতাকে আঘাত, প্রচলিত বর্ণাশ্রম প্রথায় বদলের হাওয়াটাকে তুলে আনা, কিংবা, কৃষ্ণ ও শুক্ল জাদুক্রিয়ার পিছন-মঞ্চের চাতুরিটা সহজভাবে পৌঁছে দেওয়া পাঠকের সামনে—'গ্রামের

লোককে ভয় দেখাইবার জন্য ধনুকধারী তামাসা করিয়া নেকড়ার পুঁটলি প্রভৃতি পথে ফেলিত'[৭৮] আর জাদুটোনার কার-প্রতিকারার্থে নানা বস্তু বেচে জীবিকানির্বাহকারী 'গৌরবিণী তিওরিণীর যখন উপার্জন কমিয়া আসিল, তখন সেও অন্য গ্রামে গিয়া এই কাজ করিয়া আসিত।'[৭৯] একইভাবে সন্ন্যাসী (ছদ্মবেশধারী বাবু)-র অলৌকিক কাজের পেছনে লৌকিক কারণটাও দু'পা এগিয়েই ফাঁস করে দিয়েছেন 'ফোকলা দিগম্বর' উপন্যাসে। বেশ কিছু ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার প্রয়াসও তাঁর উপন্যাসে দেখা যায়। 'পাপের পরিণাম' কাহিনিতে সুচিন্তার মৃত্যুর জন্য সাধারণে ভূতের অশুভ আগমনকে দায়ী করলে ডাক্তারের বয়ানে ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন প্রকৃত কারণ—'কন্যাটি নিতান্ত বালিকা। এত অল্পবয়সে গর্ভ হইলে এইরূপ হইয়া থাকে'[৮০], 'ফোকলা দিগম্বর'-এ প্রসূতির প্রাণহানির পেছনে বিবৃত করেছেন আঁতুড়ঘরের চিরাচরিত অস্বাস্থ্যকরতার সত্যটা। 'কঙ্কাবতী' উপন্যাসে নিরঞ্জন চরিত্রটি দিয়ে কঙ্কাবতীর স্বপ্নের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিয়ে নিয়েছেন ত্রৈলোক্যনাথ—'সমুদয় বাহ্যজগৎ যেরূপ আমাদের জাগরিত ইন্দ্রিয়-কল্পিত, কঙ্কাবতীর স্বপ্নজগতও সেইরূপ সুষুপ্ত ইন্দ্রিয় নির্ম্মিত হইয়াছিল। স্বপ্নের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত সকল স্থানেই কঙ্কাবতী বর্ত্তমান। কঙ্কাবতী দেখিতেছে, কি শুনিতেছে, কি বলিতেছে, তা ছাড়া স্বপ্নে আর কিছুই নাই। কঙ্কাবতীর যেরূপ ভ্রম হওয়া সম্ভব, স্থানে স্থানে সেইরূপ নাও দেখিতে পাই।

হাতীদিগের ন্যায় মশাদিগের নাক পরিবর্দ্ধিত হইয়া শুঁড় হয় না। আবার অন্য স্থানে, যেমন আকাশে, কল্পনা-দেবী কঙ্কাবতীর সহিত কিছু ক্রীড়া করিয়াছেন। যাহা হউক, স্বপ্নটি অদ্ভুত বলিয়া মানিতে হইবে। আমি আশ্চর্য্য হই, কঙ্কাবতী সেই মশাদিগের সংস্কৃত শ্লোকটি কি করিয়া রচনা করিয়াছিল। এ অনেক দিনের কথা। একখানি কাগজে ইহা লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। কিছুদিন পরে কাগজখানি ফেলিয়া দিই। কঙ্কাবতী বোধ হয় সেই কাগজখানি দেখিয়া থাকিবে।'[৮১] এছাড়াও একাধিক চরিত্রকে তিনি রূপায়িত করেছেন ভূতে অবিশ্বাসী, সন্ন্যাসীর অলৌকিক ক্ষমতায় সন্দিহান, যুক্তিবাদী হিসেবে।

তবুও কোনো কোনো ক্ষেত্রে, মজ্জাগত বিশ্বাস-ধারণার শক্ত নিগড় কেটে স্বাধীনভাবে পথ চলতে পারেননি ঔপন্যাসিক। দুর্দান্ত জেদে চিরাচরিত কিছু প্রত্যয়কে যাচাইয়ের অবকাশ না দিয়েই আঁকড়ে থেকেছেন প্রাণপণে। সেখানে যুক্তির ভিড়ের পেছন থেকেও ঔপন্যাসিকের অপরীক্ষিত হৃদয়বৃত্তিগুলি কাহিনির গতি-পরিণতি নিয়ন্ত্রণ করে গেছে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি উপন্যাসে।

পাপের পরিণাম-এ রায়মহাশয় মৃত্যুশয্যায় দূরবর্তী যেসব ঘটনার উল্লেখ করেছেন, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সেগুলি মিলিয়ে দিয়েছেন ঔপন্যাসিক। এ কাহিনির বিজয়বাবু আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী ত্রৈলোক্যনাথেরই প্রতিনিধিত্ব করে গেছে—'তবে একথা নিশ্চয় জানিও যে, আমরা সর্বদা নানাপ্রকার ভৌতিক জীব দ্বারা পরিবৃত হইয়া আছি।'[৮২], দাঁড় করাতে চেয়েছেন মৃত্যুকালে দূরবর্তী ঘটনা দেখার পেছনে যুক্তিস্তম্ভগুলো। লক্ষণীয়, বঙ্কিমের মতো ত্রৈলোক্যনাথও কিন্তু এ প্রসঙ্গে নিজের সমর্থনে পাশ্চাত্য বিশ্বাসকে টেনে এনেছেন: 'আমাদের শরীর ও মনের অভ্যন্তরে যাহা আছে, তাহাকে লোকে জীবাত্মা বলে। পৃথিবীতে তাহাকে ইন্দ্রিয়ের বশীভূত থাকিয়া কাজ করিতে হয়, সেজন্য তাহার শক্তি অল্প। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাতে অসীম শক্তি নিহিত আছে। কোন কোন মানুষে সেই শক্তি আপনা আপনি বিকশিত হয়, কোন কোন মানুষ নিয়মানুসারে যত্ন করিয়া সেই শক্তি বিকশিত করে, কোন কোন মানুষ পীড়িত অবস্থায় অথবা মৃত্যুকালে সেই শক্তি কিয়ৎপরিমাণে বিকশিত হয়। এই শক্তি বিকশিত হইলে মানুষের অনেক প্রকার অদ্ভুত ক্ষমতা হয়। অনেক দূরে কোন শব্দ হইলে কেহ বা তাহা শুনিতে পায়। ইংরাজীতে ইহাকে ক্লের-অডিয়েন্স (Clair-audience) বলে। অনেক দূরের ঘটনাসমূহ কেহ দেখিতে পায়। ইংরাজীতে ইহাকে ক্লের-ভয়ান্স (Clair-voyance) বলে। পাপী ও দানব বংশসম্ভূত, মনুষ্যজাতি অহিতকারী ব্যক্তিদিগের শরীর হইতে যে একপ্রকার কদাকার নীল আভা বাহির হয়, তাহাও কোন কোন ব্যক্তির দৃষ্টিগোচর হয় ও সেইরূপ লোকের দেহ হইতে যে একপ্রকার দুর্গন্ধ বাহির হয়, তাহাও তাহাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত হয়। সকল মানুষ সর্বদা যে সমুদয় ভালমন্দ ভৌতিক জীবগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া আছে, তাহাদিগকে কেহ কেহ দেখিতে পায়। এইরূপ শক্তিসম্পন্ন লোকের মধ্যে

অনেক মহাত্মা আছেন, যাঁহাদের আশীর্বাদে লোকের নিশ্চয় মঙ্গল হয়। তাঁহাদের অভিশাপও অতি ভয়ানক। মৃত্যুকালে আমার দাদামহাশয়ের মানসিক বৃত্তিসমূহ কিয়দংশে উত্তেজিত হইয়াছিল, তাহার প্রভাবেই তিনি খাঁদাভূত ও সোনা-বৌয়ের অরণ্যে রোদন দর্শন করিয়াছিলেন।"[৮৩] কঙ্কাবতী, ফোকলা দিগম্বর উপন্যাসে বিধবাবিবাহে স্বীকৃতি জানালেও এ বিষয়ে ত্রৈলোক্যনাথ বিশেষ উদার হতে পারেননি। বিধবার পুনর্বার বিয়েকে তিনি কয়েকটি শর্তের গণ্ডিতে আটকে রেখেছেন—'যে সকল বালিকা অতি অল্পবয়সে বিধবা হয়, স্বামীর সহিত যাহাদের কখনও সাক্ষাৎ হয় নাই, সংসার-ধর্মের ব্যাপারে যাহারা কিছুই জানে না, এইরূপ বালিকাদিগের নিমিত্ত বিদ্যাসাগর-মহাশয় বিধান দিয়াছিলেন।'[৮৪] 'ফোকলা দিগম্বর' বা 'পাপের পরিণাম'-এ পরলোকে বিশ্বাস বারবার তাঁর লেখনী নিয়ন্ত্রণ করেছে। পাপপুণ্য সম্পর্কে তাঁর পৌনঃপুনিক সচেতন করে তোলার প্রযত্ন কখনো কখনো কাহিনির গতি শ্লথ ও একঘেঁয়ে করে তুলেছে। প্রতিটি উপন্যাসে নিখুঁতভাবে পাপের ফল হাতেনাতে পাইয়ে দিয়েছেন ঔপন্যাসিক; পাশাপাশি জোর করে হলেও প্রত্যেক 'পুণ্যবান'-এর জন্য 'শেষপাতে মিষ্টি' জুগিয়ে গেছেন।

বস্তুত, সব কিছু উড়িয়ে পুড়িয়ে দিয়ে নিরবলম্ব হয়ে দাঁড়াবার সময়টা তখনও আসেনি, এ অধ্যায় তার পূর্ববর্তীর—যখন সমাজকে কুড়ে কুড়ে ক্ষইয়ে ফেলা 'মিথ্যা'র ঘুণগুলোকে চিহ্নিত করে, আক্রমণ করে মুমূর্ষু জাতিটার সামনে বেঁচে ওঠবার নতুন পথের সন্ধান বাৎলে দেওয়া একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল, ধ্বন্যাত্মকতায় ভর দিয়ে তাকে উঠিয়ে দাঁড় করানোর চেষ্টাটা হয়ে উঠেছিল অপরিহার্য। এক্ষেত্রে, ইংরেজরা তখন ঠিক যতখানি আধুনিক হতে পেরেছিল, বঙ্গীয় প্রয়াসটা ছিল তাদের পেছন পেছন আধুনিকীকরণের পথে ততখানিই এগোনোর। কারণ পাশ্চাত্য শিক্ষা সংস্কৃতি মারফত ততটুকুই তাদের জ্ঞানগোচরে আসা সম্ভব ছিল। তাই বঙ্কিমচন্দ্র বা ত্রৈলোক্যনাথে দেখা যায় প্রাচ্যের বিশ্বাসকে দাঁড় করাতে পাশ্চাত্য ঢুঁড়ে তার যুক্তি-অবলম্বন সংগ্রহ করে আনার প্রচেষ্টা। তবে এতে কোনো ক্ষতি, অন্যায়, লজ্জা, নিরাশা বা হীনমন্যতাবোধ ছিল না। এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমেরই একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করা যায়—

'১। সামাজিক সভ্যতার আদি দুই প্রকার; কোন কোন সমাজ স্বতঃ সভ্য হয়, কোন কোন সমাজ অন্যত্র শিক্ষা লাভ করে। প্রথমোক্ত সভ্যতালাভ বহুকালসাপেক্ষ; দ্বিতীয়োক্ত আশু সম্পন্ন হয়।

২। যখন কোন অপেক্ষাকৃত অসভ্য জাতি, সভ্যতর জাতির সংস্পর্শ লাভ করে তখন দ্বিতীয় পথে সভ্যতা অতি দ্রুত গতিতে আসিতে থাকে। সে স্থলে সামাজিক গতি এইরূপ হয় যে, অপেক্ষাকৃত অসভ্য সমাজ সভ্যতর সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়। ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম।

৩। অতএব বঙ্গীয় সমাজের দৃশ্যমান অনুকরণপ্রবৃত্তি অস্বাভাবিক বা বাঙ্গালীর চরিত্র-দোষজনিত নহে।

৪। অনুকরণ মাত্রই অনিষ্টকারী নহে, কখন কখন তাহাতে গুরুতর সুফলও জন্মে; প্রথমাবস্থায় অনুকরণ, পরে স্বাতন্ত্র্য আপনিই আসে। বঙ্গীয় সমাজের অবস্থা বিবেচনা করিলে, এই অনুকরণপ্রবৃত্তি যে ভাল নহে, এমত নিশ্চয় বলা যাইতে পারে না। ইহাতে ভরসার স্থলও আছে।'[৮৫]

তথ্যসূত্র:

১. মুখোপাধ্যায়, ধ্রুবকুমার(সম্পাদিত)। *বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের চন্দ্রশেখর,* রত্নাবলী, কলকাতা-০৯, ২০০৪, পৃ- ১৬৮

২. *বঙ্কিম রচনাবলী,* তুলি-কলম, কলকাতা-০৯, ১৯৮৬, পৃ- ৩৫১

৩. তদেব, পৃ- ৩৫১

৪. তদেব, পৃ- ৮৩৭-৩৮

৫. তদেব, পৃ- ৭৩৯

৬. তদেব, পৃ- ৬৩

৭. তদেব, পৃ- ১৪৭

৮. তদেব, পৃ- ৪৪৪

৯. তদেব, পৃ- ২৯৭

১০. তদেব, পৃ- ১২৮

১১. তদেব, পৃ- ৫২৩

১২. তদেব, পৃ- ৪৭৬

১৩. তদেব, পৃ- ৩৫

১৪. তদেব, পৃ- ১৯৬

১৫. তদেব, পৃ- ২৪৫

১৬. তদেব, পৃ- ৯৩

১৭. তদেব, পৃ- ১১৫

১৮. তদেব, পৃ- ৪৫২

১৯. তদেব, পৃ- ১৪২

২০. তদেব, পৃ- ৮২৮

২১. তদেব, পৃ- ৮০৪

২২. তদেব, পৃ- ৩২৬

২৩. তদেব, পৃ- ৩৩

২৪. তদেব, পৃ- ১০১

২৫. তদেব, পৃ- ১১৫

২৬. তদেব, পৃ- ৭৪০

২৭. তদেব, পৃ- ৮৫

২৮. তদেব, পৃ- ৮৫

২৯. তদেব, পৃ- ৩৬৫

৩০. তদেব, পৃ- ৩৫৮

৩১. তদেব, পৃ- ৯১

৩২. তদেব, পৃ- ৯৯

৩৩. তদেব, পৃ- ৯৯

৩৪. তদেব, পৃ- ৩৬০

৩৫. তদেব, পৃ- ৩৬৫

৩৬. তদেব, পৃ- ৪৭৫-৭৬

৩৭. তদেব, পৃ- ৩৬১

৩৮. তদেব, পৃ- ৩৫৬

৩৯. তদেব, পৃ- ৫০৩

৪০. তদেব, পৃ- ৫২০

৪১. তদেব, পৃ- ৭০৭

৪২. তদেব, পৃ- ৪৩৪

৪৩. তদেব, পৃ- ৪২৬

৪৪. তদেব, পৃ- ২০৭

৪৫. তদেব, পৃ- ৫০৩

৪৬. তদেব, পৃ- ৬৯০

৪৭. তদেব, পৃ- ৬৯০

৪৮. বিশ্বাস, ড. অচিন্ত্য। *কঙ্কাবতী: বাস্তব ও স্বপ্নের নক্‌শিকাঁথা*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, দোলযাত্রা ২০১২, পৃ- ২৫

৪৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার। *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* (*নবম খণ্ড*), মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৯, পৃ- ১০১

৫০. মুখোপাধ্যায়, সুদেব (সম্পাদক)। *ত্রৈলোক্যনাথ রচনাবলী*, কামিনী প্রকাশালয়, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃঃ ৬৭

৫১. তদেব, পৃ- ৬৯

৫২. তদেব, পৃ- ৪৯

৫৩. তদেব, পৃ- ২১১

৫৪. তদেব, পৃ- ৩৩০

৫৫. তদেব, পৃ- ৩৩৭

৫৬. তদেব, পৃ- ৩৩৮

৫৭. তদেব, পৃ- ৩৩৮

৫৮. তদেব, পৃ- ২২৪

৫৯. তদেব, পৃ- ২৬৭

৬০. তদেব, পৃ- ৩৬

৬১. তদেব, পৃ- ৩৩৬-৩৭

৬২. তদেব, পৃ- ৩৩৮

৬৩. তদেব, পৃ- ৩৩৯

৬৪. তদেব, পৃ- ২০৩

৬৫. তদেব, পৃ- ৩০০

৬৬. তদেব, পৃ- ২৩৮-৩৯

৬৭. তদেব, পৃ- ৩৩২

৬৮. তদেব, পৃ- ২৬২

৬৯. তদেব, পৃ- ২৮৫

৭০. তদেব, পৃ- ৩০৪

৭১. তদেব, পৃ- ৩৬

৭২. তদেব, পৃ- ২৬৯

৭৩. তদেব, পৃ- ১৪৪

৭৪. তদেব, পৃ- ২১০

৭৫. তদেব, পৃ- ৩০৯

৭৬. তদেব, পৃ- ৭১

৭৭. প্রাগুক্ত, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* (*নবম খণ্ড*), পৃ- ১০০

৭৮. তদেব, পৃ- ৪০৫

৭৯. তদেব, পৃ- ৪০৫

৮০. তদেব, পৃ- ৩১৮

৮১. তদেব, পৃ- ১৫৯

৮২. তদেব, পৃ- ৪৪৪

৮৩. তদেব, পৃ- ৪৪৩-৪৪

৮৪. তদেব, পৃ- ২৭৭-৭৮

৮৫. চক্রবর্তী, সুবোধ (সম্পাদনা)। *বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড,* কামিনী প্রকাশালয়, কলিকাতা, পঞ্চম প্রকাশ শ্রাবণ ১৪১৬, পৃ- ২০৩-২০৪